ফুটবল (Football)

ইতিহাস : বিশ্বে প্রথম ফুটবল খেলা কবে কোথায় আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারে বহু মতভেদ আছে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে চিন দেশে প্রথম এই খেলার প্রচলন হয়। কিন্তু আরো একদল ঐতিহাসিকদের মতে ফুটবলের জন্ম ইংল্যান্ডেই। আবার অন্য দলের মতে রোম দেশেই ফুটবলের জন্ম। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই খেলা ইংল্যান্ডে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৬০৩ সাল থেকে ফুটবল খেলার নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম চালু করা হয়। ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়, ১৮৭১ সালে ইংল্যান্ডে পেশাদারী ফুটবল খেলার প্রচলন শুরু হয়। ১৮৮৮ সালে প্রথম ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হয। ১৯০৪ সালে প্যারিসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশন্যাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা) গঠিত হয়। এই সংস্থাই ১৯৩০ সাল থেকে প্রতি চার বছর অন্তর বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে।

ফুটবল খেলার মাঠ

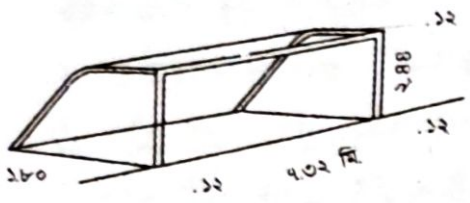

কর্ণার ফ্লাগ

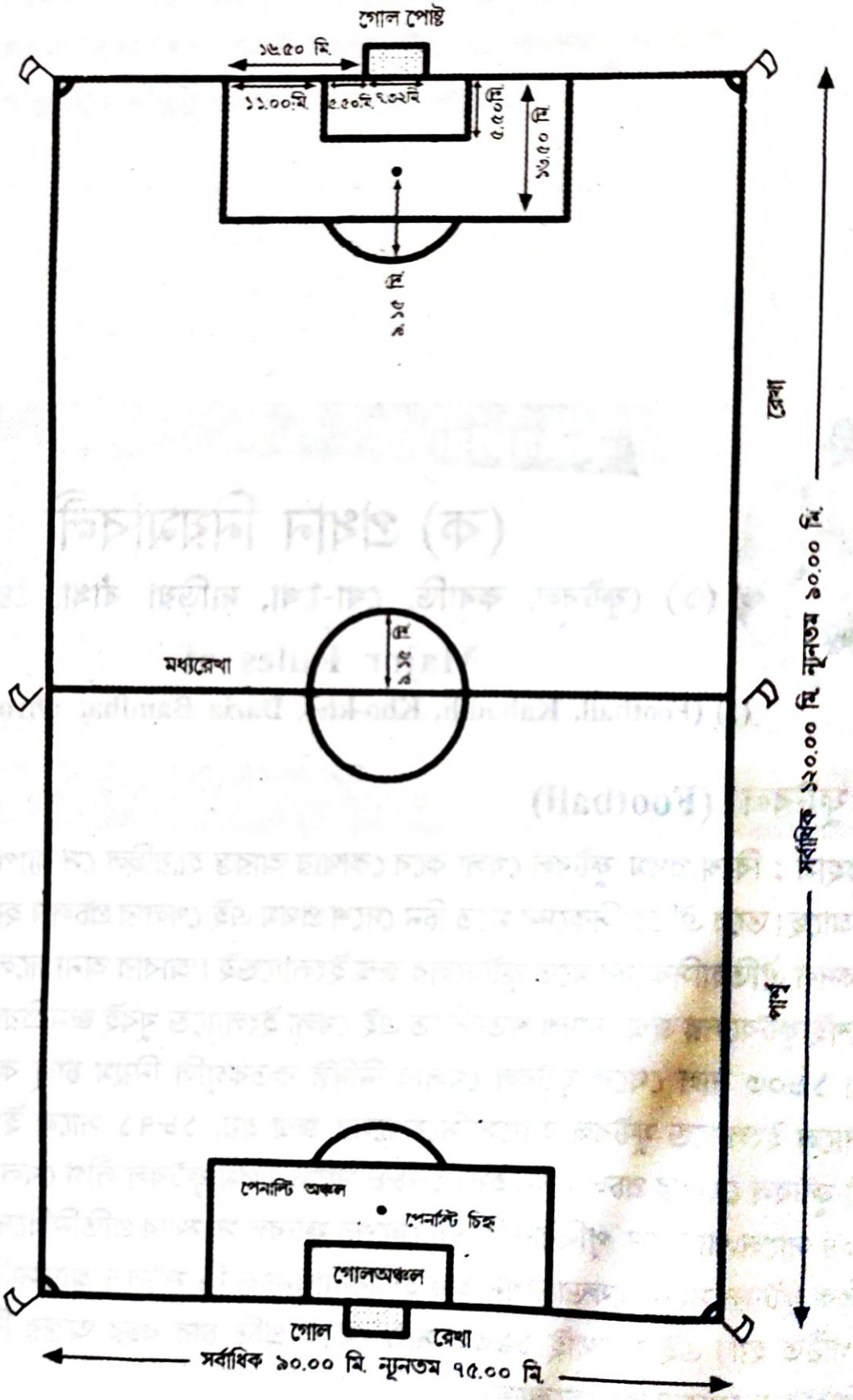

সরকারিভাবে ১৯০৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ফুটবল খেলার প্রচলন হয়। ১৮৬৮ সালে কলকাতায় প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়। ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রথম ভারতীয় ফুটবল ক্লাব ডালহৌসি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (I.F.A.) গঠিত হয়। ১৯৪১ সাল থেকে আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ভারত প্রথমবার ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্নরকম প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে যেমন ডুরান্ড কাপ, রোভার্স কাপ, ফেডারেশন কাপ, নেহরু কাপ ইত্যাদি।

● সাধারণ নিয়মাবলি :

১) ফুটবল খেলার মাঠ আয়তাকার হবে, যা লম্বায় সর্বাধিক ১৩০ গজ (১২০মি.) এবং ন্যূনতম ১০০ গজ (৯০ মি.), চওড়া সর্বাধিক ১০০ গজ (৯০ মি.) ও ন্যূনতম ৫০ গজ (৪৫ মি.)। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক খেলায় মাঠের দৈর্ঘ্য ১১০-১২০ গজ ও প্রস্থে ৭০-৮০ গজ হয়। এই আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্যের দিকে রেখাগুলিকে পার্শ্বরেখা বা টাচলাইন এবং প্রস্থের দিকে রেখাগুলিকে প্রান্তরেখা বা গোললাইন বলা হয়।

২) মাঠের দাগগুলি সর্বাধিক ৫ ইঞ্চির বেশি চওড়া হবে না। মাঠের চারকোণে কমপক্ষে ৫ ফুট উঁচু ফ্লাগ লাগানো পোস্ট দেওয়া থাকবে। মাঠের মাঝখানে মধ্যরেখা থাকে এবং মধ্যরেখার মাঝে ১০ গজ (৯.১৫ মি.) ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত থাকে।

৩) মাঠের দুদিকে গোললাইনের ঠিক মাঝখানে মাটি থেকে ৮ ফুট (২.৪৪ মি.) উঁচু দুটো গোল পোস্ট থাকে এবং দুই গোল পোস্টের ভিতরকার দূরত্ব ৮ গজ (৭.৩২ মি.) হয়। গোলপোস্ট দুটির ওপর ক্রসবার দেওয়া থাকে। গোলপোস্টের কাঠ বা ধাতুর অংশ ৫ ইঞ্চির বেশি চওড়া হবে না।

৪) গোল পোস্ট থেকে উভয়দিকে গোললাইনের উপর ৬ গজ দূরে সমকোণে ৬ গজ ভিতর যে আয়তাকার স্থান অর্থাৎ ২০ গজ লম্বা ও ৬ গজ চওড়া অংশকে গোল এরিয়া বলে।

৫) গোল পোস্টের উভয়দিকে গোল লাইনের ওপর ভিতরদিকে সমকোণে ১৮ গজ চওড়া ও ৪৪ গজ লম্বা অঞ্চল পেনাল্টি এরিয়া।

৬) ফুটবল খেলার বল সবসময় গোলাকার হবে। বলের পরিধি ২৭-২৮ ইঞ্চি, ওজন ১৪-১৫ আউন্স বা ৪১০-৪৫০ গ্রাম। বলের ভেতরকার বায়ুচাপ ৬০০-১১০০ গ্রাম/সেমি^{2}। রেফারির অনুমতি ছাড়া খেলা চলাকালীন বল বদল করা যাবে না।

৭) ফুটবল খেলা দুটি দলের মধ্যে হয়। প্রতি দলে সর্বাধিক ১১ জন খেলোয়াড় খেলায় অংশ নেয় এবং তার মধ্যে একজন গোলরক্ষক থাকে। প্রতি দল ন্যূনতম ৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রতিদলে সর্বোচ্চ ৫ জন অতিরিক্ত

খেলোয়াড় থাকতে পারে এবং এই খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে ৩ জন বদলি খেলোয়াড় হিসাবে খেলানো যেতে পারে।

৮) ফুটবল খেলা ৪৫ মিনিটের দুটি সমান অর্ধ ও মাঝে ১৫ মিনিট বিরতিসহ মোট ৯০ মিনিটের হবে।

৯) খেলা আরম্ভের আগে টসে যে দল জিতবে তাদেরই ঠিক করতে হবে তারা কোন্ দিকে আক্রমণ করবে। ও যে দল টসে হারবে তারা কিক্ অফ করে খেলা আরম্ভ করবে। কিক অফ থেকে সরাসরি গোল হতে পারে।

১০) রেফারি খেলা আরম্ভের নির্দেশ দিলে দলের যে-কোনো একজন খেলোয়াড় বলটিকে মেরে সামনে এগিয়ে দিলেই খেলা আরম্ভ বলে গণ্য হবে।

১১) বলের সম্পূর্ণ অংশ যখন শূন্যে বা মাটির ওপর দিয়ে টাচলাইন বা গোললাইন অতিক্রম করে তখন বল খেলার বাইরে বলে গণ্য করা হয়। খেলা চলাকালীন বল যখন গোল পোস্ট, ক্রসবার, বা কর্নার ফ্লাগ বা মাঠের মধ্যে থাকা অবস্থায় রেফারি বা লাইন্সম্যানের গায়ে লেগে বল মাঠের মধ্যে থাকে তখন বল খেলার মধ্যে হিসাবে গণ্য করা হবে।

১২) কোনো নিয়ম না ভেঙে যদি বলের সম্পূর্ণ অংশ দুই গোল পোস্ট ও ক্রসবারের মধ্য দিয়ে গোললাইন সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে তবে তাকে গোল হিসাবে গণ্য করা হবে।

১৩) যে মুহূর্তে বল খেলা হচ্ছে ঠিক সে সময়ে কোনো আক্রমণকারী খেলোয়াড় বল ও দ্বিতীয় শেষ প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রতিপক্ষের গোললাইনের দিকে এগিয়ে বা কাছাকাছি থাকবে তখনই অফসাইড বলা হবে। অবশ্য অফসাইড ধরা হবে না সে যদি—

ক) নিজের মাঠের অর্ধে থাকে।

খ) প্রতিপক্ষের শেষ দুই খেলোয়াড়ের লাইন বরাবর থাকে।

গ) প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় শেষ খেলোয়াড়ের লাইন বরাবর থাকে।

ঘ) বলটি সরাসরি গোলকিক, কর্নার কিক, থ্রো-ইন থেকে পেয়ে থাকে।

১৪) কোনো খেলোয়াড় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নীচের দশটি অপরাধের মধ্যে যে-কোনো একটি অপরাধ করে তখন তার বিরুদ্ধে সরাসরি ডাইরেক্ট ফ্রি-কিকের আদেশ দেওয়া হয়।

এই দশটি অপরাধ হল—

ক) বিপক্ষকে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।

খ) বিপক্ষকে যে-কোনোভাবে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা।

গ) বিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়া।

ঘ) বল নেওয়ার জন্য বিপক্ষকে বিপজ্জনকভবে আক্রমণ করা বা প্রতিরোধ করা।

ঙ) বিপক্ষ বাধা না দেওয়া সত্ত্বেও তকে আক্রমণ করা।

চ) বিপক্ষকে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।

ছ) বিপক্ষকে ধরে রাখা।

জ) বিপক্ষকে ধাক্কা মারা বা ঠেলে দেওয়া।

ঝ) ইচ্ছাকৃত ভাবে হাত দিয়ে বল ধরা।

ঞ) বিপক্ষকে থুতু দেওয়া।

খেলা চলাকালীন প্রতিরক্ষাকারী দল যখন এই দশটি অপরাধের যে-কোনো একটি নিজেদের পেনাল্টি অঞ্চলের মধ্যে করে তখন রেফারি তাদের বিরুদ্ধে "পেনাল্টি কিকের" আদেশ দেবেন।

১৫) যদি কোনো খেলোয়াড় নীচের পাঁচটি অপরাধের কোনো একটি করে তবে রেফারি তার বিরুদ্ধে ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক এর আদেশ দেন।

ক) গোলরক্ষক যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে।

খ) বল খেলার চেষ্টা না করে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া।

গ) আয়ত্তের বাইরের বলকে খেলার চেষ্টা না করে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষকে কাঁধের সাহায্যে চার্জ করা।

ঘ) বল ধরে থাকা, বিপক্ষকে বাধা দেওয়া, গোল এরিয়ার বাইরে থাকা অবস্থা ছাড়া গোলরক্ষককে চার্জ করলে।

ঙ) যদি কোনো খেলোয়াড় বিপজ্জনকভাবে খেলে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, গালিগালাজ করে এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও বারবার অসদাচরণ করে তাহলে রেফারি সেই খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে পাঠাতে পারেন।

১৬) ফ্রি-কিক দুই প্রকারের হয়—ডাইরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল করা যায়। আর ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল করা যায় না। অন্য খেলোয়াড়ের স্পর্শ ছাড়া গোল হয় না।

১৭) পেনাল্টি স্পট থেকে পেনাল্টি কিক নেওয়া হয় সামনের দিকে। যে খেলোয়াড় কিক নেবে সে ছাড়া অন্য খেলোয়াড়রা সকলেই পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে এবং পেনাল্টি স্পট থেকে অন্তত দশ গজ দূরে থাকবে। বিপক্ষদলের গোলরক্ষক গোললাইনের উপর দাঁড়াবে এবং পায়ের পাতা নাড়াতে পারবে না। কিক করার পর অন্যের স্পর্শ ছাড়া যে কিক করেছিল সে খেলতে পারবে না। এই কিক থেকে সরাসরি গোল করা যায়।

১৮) আক্রমণকারীর স্পর্শে যখন বলটা সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষের প্রান্তরেখা বা গোললাইনকে অতিক্রম করে বাইরে চলে যায় গোলপোস্টের ভিতরের অংশ বাদ দিয়ে তখন রক্ষণকারী দল গোল কিক পায়। গোল কিক গোল এরিয়ার মধ্য থেকে করতে হয়। গোল কিক থেকে সরাসরি বিপক্ষে গোল করা যায়।

১৯) বলের সমগ্র অংশ যখন সম্পূর্ণভাবে টাচলাইন অতিক্রম করে বাইরে চলে যায় তখন থ্রো ইন হয়। যে দলের খেলোয়াড়ের স্পর্শে বল বাইরে গিয়েছে তাদের বিপক্ষ দল থ্রোইন পাবে। থ্রোইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

২০) রক্ষণকারী দলের স্পর্শে যখন বলের সম্পূর্ণটা গোলপোস্টের ভেতর অংশ বাদ দিয়ে গোললাইন অতিক্রম করে বাইরে চলে যায় তখন বিপক্ষ দল কর্নার কিক পায়। যে দিক দিয়ে বল বাইরে গিয়েছে সেই দিকের কর্নার পতাকার কাছে যে বৃত্ত আছে তার মধ্যে থেকে কিক করতে হবে। এই কিক থেকে সরাসরি গোল করা যায়।

২১) যে দল অধিক সংখ্যক গোল করবে তারা বিজয়ী হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যদি দুদল সমসংখ্যক গোল করে বা খেলা ড্র হয়ে যায়। যদি খেলার জয় নির্ধারণ করতেই হয় তবে অতিরিক্ত ১৫ মিনিটের দুটি অর্ধ খেলার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে, তাতে না হলে টাইব্রেকার এর মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি করতে হবে।

২২) ফুটবল খেলা পরিচালনার দায়িত্ব চারজনের উপর থাকে। এর মধ্যে প্রধান হলেন রেফারি যার উপর মাঠে খেলা পরিচালনার মূল দায়িত্ব থাকে। প্রধান রেফারিকে সাহায্য করার জন্য দুজন সহকারী রেফারি বা লাইন্সম্যান থাকেন। এছাড়া চতুর্থ রেফারি মাঠের বাইরে থেকে খেলা পরিচালনাতে সাহায্য করেন।

কবাডি (Kabaddi)

ইতিহাস : কবাডি খেলা প্রাচীন ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল। ছত্রপতি শিবাজির আমল থেকেই এই খেলার প্রচলন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই খেলা বিভিন্ন নামে প্রচলিত যেমন—মহারাষ্ট্রে হুতুত, মধ্যপ্রদেশে ও গুজরাটে চেডু গুডু, পাঞ্জাবে মাবারখানা, পশ্চিমবঙ্গে হাডুডু, ভারতের বাইরে বাংলাদেশে চু-কিত-কিত, শ্রীলঙ্কায় গুডু, থাইল্যান্ডে থিকার। ১৯১৮ সাল নাগাদ মহারাষ্ট্রের সাঁতারা অঞ্চলের আশেপাশে এই খেলার প্রচলন শুরু হয়। তখন থেকে এই খেলা সঞ্জীবনী, গনিমি বা অমর নামে খেলা হত। ১৯২১ সালে মহারাষ্ট্রে শ্রী ভি. আর. পরাঞ্জপে, শ্রী যশোবন্ত রাও পাঠক ও শ্রী কে. কে. বিন্দ্রে মিলে কবাডি খেলার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করেন। ১৯২৮ সালে বরোদাতে সর্বভারতীয় কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কবাডি খেলাকে জাতীয় খেলাধুলার প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৫০ সালে বোম্বাইতে শ্রী এস. গৌড়বোলের সভাপতিত্বে প্রথম ভারতীয় কবাডি সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে কবাডি খেলার কিছু নিয়ম সংশোধন করে মাদ্রাজে প্রথম জাতীয় কবাডি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ১৯৫৩ সালে প্রথম মহিলাদের প্রদর্শনমূলক খেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৭৭ সালে কবাডির প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোরের এন. এস. এন. আই. এস. কেন্দ্রে কবাডি ও খো খো খেলার ওপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। ১৯৮২ সালে দিল্লির নবম এশিয়ান গেমসে কবাডি প্রদর্শনী খেলা হিসাবে স্থান পায়।

বর্তমানে বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান এবং জাপানে এই খেলা চালু হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার উদ্যোগে এশিয়ান অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবাংলা থেকে শ্রী ভোলানাথ গুইন প্রথম কবাডি খেলাতে অর্জুন পুরস্কার পান।

● সাধারণ নিয়মাবলি :

১) কবাডি মাঠ আয়তাকার ও সমতল, আয়তন অনুসারে কবাডি মাঠ তিন রকমের হয়—

ক) পুরুষ (অনূর্ধ্ব ৮০ কে. জি.)/জুনিয়র বালকদের (৬৫ কেজি ও ২০ বছর ও অনূর্ধ্ব)—১৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১০ মিটার প্রস্থ।

খ) মহিলা জুনিয়র বালিকা (৬০ কেজি ও ২০ বছর ও অনূর্ধ্ব)—১২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার প্রস্থ।

গ) সাবজুনিয়র বালক ও বালিকা (৫০ কেজি ও ১৫ বছর ও অনূর্ধ্ব)—১১ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার প্রস্থ।

কবাডি খেলার মাঠ

পুরুষ ও জুনিয়র বালক

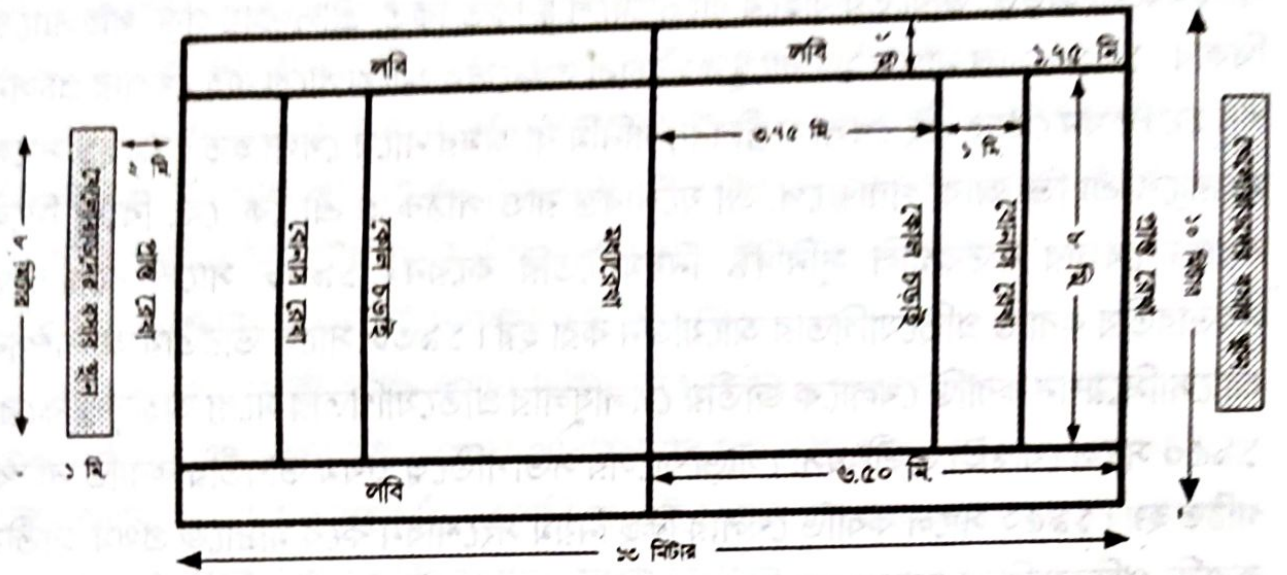

মহিলা ও জুনিয়র বালিকা

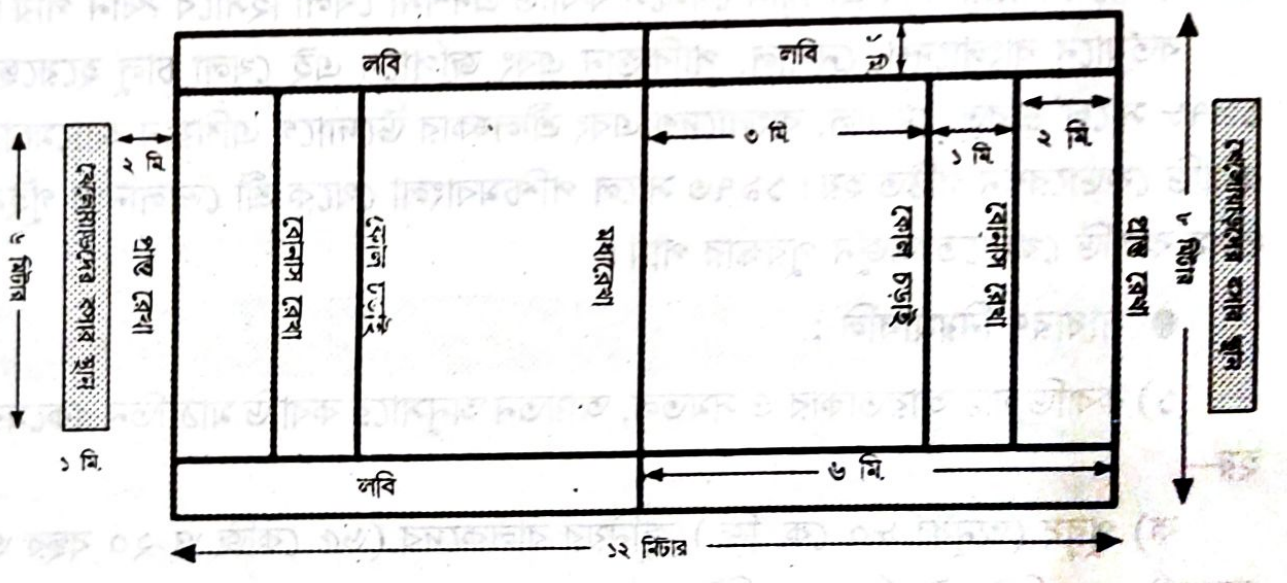

সাব জুনিয়র বালক ও বালিকা

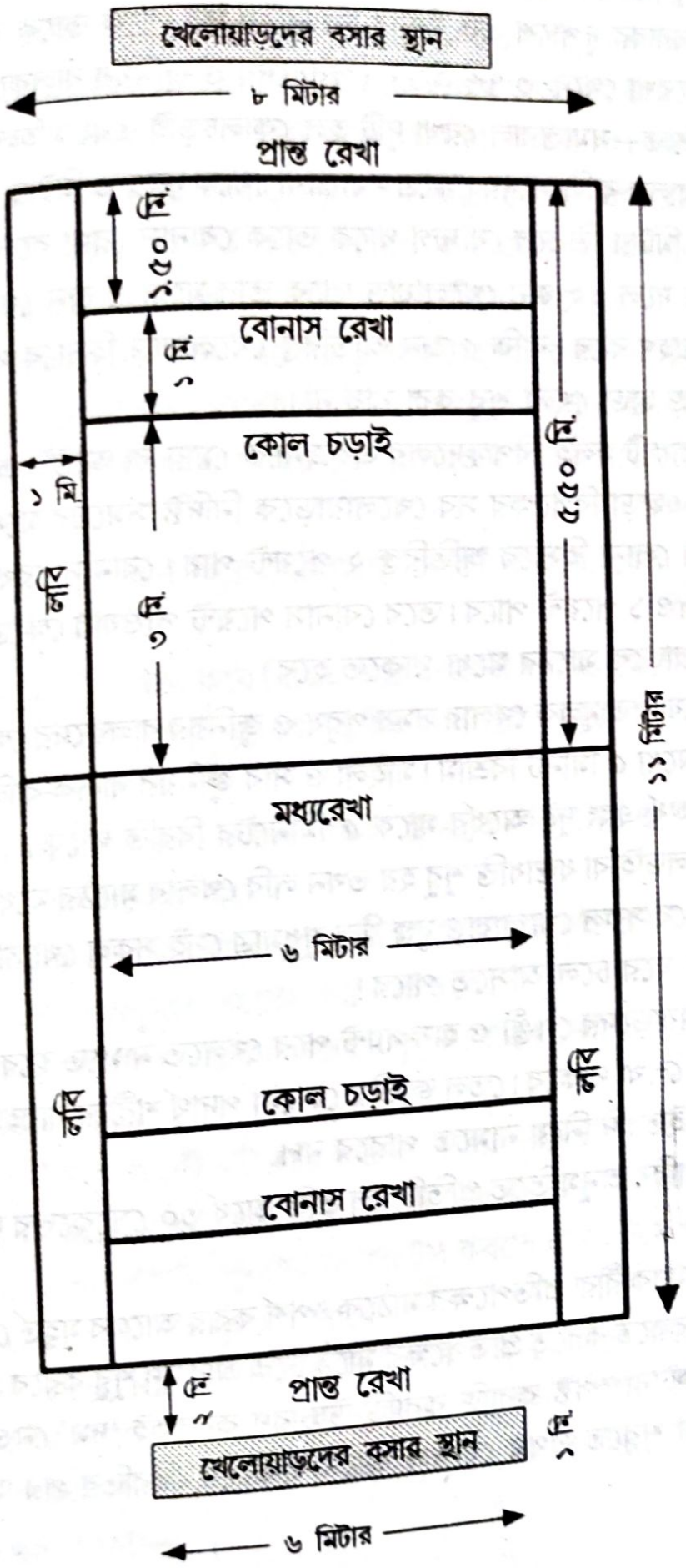

২) খেলার মাঠের চারদিকে ৫ সেমি চওড়া রেখা থাকে এবং ৫ সেমি চওড়া রেখাটাকে মাঠের মাপের মধ্যেই ধরা হয়।

৩) সম্পূর্ণ খেলার মাঠটিকে সমান দুভাগে ভাগ করে যে রেখা তাকে মধ্যরেখা বলে। মাঠের লম্বা বরাবর দুপাশে এক মিটার চওড়া যে ঘর থাকে তাকে লবি বলে।

৪) মধ্যরেখা থেকে ৩·৭৫ মিটার (পুরুষদের ও জুনিয়র বালকদের ক্ষেত্রে) দূরত্বে দুপাশে অবস্থিত—সমান্তরাল রেখা দুটি হল কোলচড়াই এবং মহিলা জুনিয়র বালিকা, সাব জুনিয়র বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে মধ্যরেখা থেকে দূরত্ব ৩ মিটার, কোলচড়াই রেখার সমান্তরাল ১ মিটার ভিতরে যে দাগ থাকে তাকে বোনাস রেখা বলে।

৫) প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে তার মধ্যে ৭ জন খেলোয়াড় একসঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণ করে। বাকি ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে থাকে। কমপক্ষে ৭ জন খেলোয়াড় ছাড়া খেলা শুরু করা যায় না।

৬) প্রত্যেকটি দলই বিপক্ষদলের একজনকে মোর বা আউট করতে পারলে এক পয়েন্ট পায়। এছাড়া বিপক্ষের সব খেলোয়াড়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোর বা আউট করতে পারলে লোনা হিসাবে অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পায়। বোনাস রেখা অতিক্রম করলে মোর না করলেও ১ পয়েন্ট পাবে। তবে বোনাস পয়েন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে বিপক্ষের অন্তত ৬ জন খেলোয়াড়কে মাঠের মধ্যে থাকতে হবে।

৭) প্রতিযোগিতামূলক খেলার সময় পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের ক্ষেত্রে ২০ মিনিটের দুটি অর্ধ এবং মধ্যে ৫ মিনিট বিশ্রাম। মহিলা ও সাব জুনিয়র বালক-বালিকাদের জন্য ১৫ মিনিটের দুটি অর্ধ এবং দুই অর্ধের মাঝে ৫ মিনিটের বিরতি থাকে।

৮) যখন লড়াই বা ধস্তাধস্তি শুরু হয় তখন লবি খেলার মাঠের মধ্যে গণ্য হয়। লড়াই বা ধস্তাধস্তিতে যে সকল খেলোয়াড় যুক্ত ছিল শুধুমাত্র সেই সকল খেলোয়াড় লবি ব্যবহার করে নিজ নিজ ঘরে চলে আসতে পারে।

৯) খেলোয়াড়দের গেঞ্জী ও হাফপ্যান্ট পরে খেলতে নামতে হবে। গেঞ্জীর সামনে ও পিছনে নম্বর লেখা থাকবে। তেল জাতীয় কোনো পদার্থ শরীরে ব্যবহার বা আংটি চুড়ি, দুল, ক্লিপ, নখ ইত্যাদি নিয়ে নামতে পারবে না।

১০) রেফারির অনুমতিতে প্রতিটি দল প্রতি অর্ধে ৩০ সেকেন্ডের দুটি টাইম আউট নিতে পারে।

১১) আক্রমণকারীরা প্রতিপক্ষের মাঠকে স্পর্শ করার আগের মুহূর্ত থেকে স্পষ্টভাবে কবাডি উচ্চারণ করতে করতে প্রতিপক্ষের মাঠে ঢুকে আক্রমণ শুরু করবে। নিশ্বাস না নিয়ে ও না থেমে একটানা স্পষ্ট কবাডি কবাডি উচ্চারণ করাকেই 'দম' নেওয়া বলা হয়।

১২) খেলা শুরুতে প্রথম যে দল আক্রমণ করবে, বিরতির পর অপরদল প্রথমে আক্রমণে যাবে।

১৩) খেলার নির্ধারিত সময়ে সর্বাধিক ৫ জন খেলোয়াড়কে রেফারির অনুমতি নিয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১৪) যখন আক্রমণকারীকে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে গলা বা মুখ টিপে দম বন্ধ করার চেষ্টা করে বা হিংসাত্মক উপায়ে আহত করে বা করার চেষ্টা করে, যে-কোনো প্রকারের কাঁচি দিয়ে ধরে বা কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করে তবে রেফারি বা আম্পায়ার এই আক্রমণকারীকে আউট বলে ঘোষণা করবে না। বরং ওই সমস্ত অপরাধের জন্য আক্রমণকারী খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দেবেন এবং Card ব্যবহার করবেন (সবুজ, হলুদ, লাল)। সতর্ক করার পরেও যদি এইরকম অপরাধ করে তবে তাকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করে বিপক্ষ দলকে পয়েন্ট দিতে পারেন।

১৫) কোনো দলের যে কজন খেলোয়াড় আউট হবে বিপক্ষ দলের সেই কজন আউট হওয়া খেলোয়াড়দের মধ্য থেকেই পর্যায়ক্রমে আবার খেলার জন্য মাঠে নামবে।

১৬) নক আউট খেলায় নির্ধারিত সময় খেলার পরও দু দলের পয়েন্ট সমান থাকলে টাই ভাঙার পদ্ধতি হল—

ক) প্রত্যেক দলের ৭ জন করে খেলোয়াড় কোর্টে থাকবে, খেলা আরম্ভের পর কোনো বদল হবে না।

খ) প্রত্যেক দলেরই ৫ জন করে বিভিন্ন আক্রমণকারী পর্যায়ক্রমে আক্রমণে যাবে।

গ) উভয় দলের ৫জন করে আক্রমণকারীর নাম চেস্ট নাম্বারসহ খেলার আগে রেফারিকে জানাতে হবে।

ঘ) এই সময় বাক লাইন "বোনাস লাইন" হিসাবে পরিগণিত হবে এবং বোনাস পয়েন্টের যাবতীয় নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

ঙ) এই পদ্ধতিতে কোনো খেলোয়াড় আউট হয়ে মাঠের বাইরে যাবে না বা বাইরে থেকে কোর্টে আসবে না শুধুমাত্র পয়েন্ট গণ্য করা হবে।

চ) খেলা শুরুর সময় যে দল প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিল সেই দলই প্রথম আক্রমণে যাবে। আর টস করা হবে না।

ছ) পর্যায়ক্রমে উভয় দল ৫টি ৫টি করে আক্রমণ করার পরও যদি ফলাফল ড্র বা সমান সমান থাকে তবে Golden Raid পদ্ধতিতে খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারিত করতে হবে।

জ) Golden Raid পদ্ধতি পুনরায় আবার টস করতে হবে। টসে যে দল জিতবে তারা প্রথম Golden Raid এর সুযোগ পাবে।

ঝ) প্রথম Golden Raid-এ টাই হলে বিপক্ষ দল Golden Raid-এর সুযোগ পাবে। যে দল প্রথম পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারবে সেই দলই বিজয়ী হবে।

ঞ) খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি, দুজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দুজন সহকারী স্কোরার থাকেন।

খো-খো (Kho-Kho)

ইতিহাস : খো-খো আমাদের দেশীয় খেলা এবং এই খেলার বেশি প্রচলন পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের সীমানা লাগোয়া গ্রামগুলোতে। এই খেলা ওই সব অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ১৯১৪ সালে পুনেতে (মারাঠা ডিকান জিমখানা ক্লাবে) এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিকে একটি সভা করে খো-খো খেলার নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি হয়। সেই নিয়ম অনুসারেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই খেলার প্রচলন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে মহারাষ্ট্রের শ্রীভাই নুরুলকারের নেতৃত্বে ভারতের খো খো সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৬০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়াতে পুরুষদের প্রথম জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে মহিলাদের প্রথম জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে ব্যাঙ্গালোরের এন. এস. এন. আই. এস. কেন্দ্রে খো খো ও কবাডির প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স আরম্ভ হয়। ১৯৮২ সালে দিল্লির নবম এশিয়ান গেমসে খো খো খেলা প্রদর্শিত হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সাফ গেমস আসরে 'খো-খো' পুরুষ দলের অভিপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন খো-খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবাংলার কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে প্রথম পুরুষদের "এশিয়ান খো খো প্রতিযোগিতা" অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রায় সব রাজ্যই জাতীয় 'খো খো' প্রতিযোগিতার আসরে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে।

● সাধারণ নিয়মাবলি :

১) খো-খো খেলার মাঠ আয়তাকার ও সমতল হয়। পুরুষ, মহিলা ও জুনিয়র বালক ও বালিকাদের জন্য মাঠের দৈর্ঘ্য ২৯ মি. ও প্রস্থ ১৬ মি.। সাব-জুনিয়র বালক বালিকাদের মাঠের দৈর্ঘ্য ২৫ মি. ও প্রস্থ ১৪ মি.। আয়তাকার মাঠের দুই প্রান্তে দুটি ছোটো আয়তাকার অংশ থাকে যার প্রত্যেকটি লম্বা ১৫ মি. ও চওড়া ২·৭৫ মি.। এই অংশ দুটিকে 'ফ্রিজোন' বলে। কেন্দ্রপথ (Central Line) ২৩·৫০ মি. লম্বা ও ৩০ সেমি চওড়া। কেন্দ্রপথ ও এড়োপথ পরস্পর ছেদের ফলে ৩০ সেমি × ৩০ সেমি বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। অনুধাবকেরা ওই আটটি বর্গে পরপর বিপরীত দিকে মুখ করে বসে। পোল লাইন থেকে নিকটতম এড়ো পথের দূরত্ব ২·৫০ মি. এবং অন্য এড়োপথগুলির মধ্যে দূরত্ব ২·৩০ মি.। সাব-জুনিয়র বালক বালিকাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রপথ ১৯·৯০ মি. লম্বা ও ৩০ সেমি চওড়া। ফ্রিজোন ১৪ মি. × ২·৫৫ মি.। পোল লাইন থেকে নিকটতম এড়োপথের দূরত্ব ২·১০ মি. অন্য এড়োপথগুলির মধ্যে দূরত্ব ১·৯০ মি.।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ C M
প্রান্ত রেখা ১৬ মি.
মুক্ত অঞ্চল
পোষ্টরেখা
৩০ x ৩০ সে.মি.
পাশ্বরেখা
৭.৮৫ মি.
মুক্ত অঞ্চল
১.৫০ মি.
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ C M
প্রবেশ অঞ্চল
প্রবেশ অঞ্চল
স্কোরার
সময় রক্ষক

২) মাঠের দু পাশের শেষ বর্গক্ষেত্রের পর সেখান থেকে মুক্তাঞ্চল শুরু ঠিক তার মাঝে জমির উপরে ১·২০ মি. থেকে ১·২৫ মি. উচ্চতার ও ৯ থেকে ১০ সেমি ব্যাসযুক্ত সর্বত্র মসৃণ দুটি কাঠের দণ্ড বা পোল থাকে।

৪) খো খো খেলা দুটি দলে হয়। একই সময় একটি দল ধাবকের (Runner) ও অন্য দলটি অনুধাবকের (Chaser) ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি দলে ১২ জন করে খেলোয়াড় থাকে। কিন্তু ৯ জন করে খেলোয়াড় মূল খেলায় অংশগ্রহণ করে।

৫) খেলা হয় দুটি পর্যায়ে (Innings)। পুরুষ, মহিলা, জুনিয়র বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি Innings ৯ মিনিটের এবং দুটি পর্যায় এর মধ্যে ৫ মিনিটের বিরতি থাকে। আবার দুটি পর্যায়ের মধ্যে ৯ মিনিট বিরতি থাকে। অর্থাৎ খেলা হয় ৯ + ৫ + ৯ + (বিরতি ৯) + ৯ + ৫ + ৯ = মোট ৫৫ মিনিট। একইভাবে সাব-জুনিয়র বালক বালিকাদের খেলার সময় হল ৭ + ৩ + ৭ + (৬ বিরতি) + ৭ + ৩ + ৭ = মোট ৪০ মিনিট।

১০) টসে জয়ী অধিনায়ক হাত তুলে ধাবক ও অনুধাবক হওয়ার মতামত জানাবে। অনুধাবক দলের আটজন খেলোয়াড় পরস্পর বিপরীত মুখ করে বর্গে বসবে এবং একজন সক্রিয় অনুধাবক ফ্রি জোনে দাঁড়াবে। পর্যায় শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথম তিনজন ধাবক মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবে। তিনজন ধাবকের শেষজন আউট হওয়ার পর পরবর্তী তিনজন ধাবককে দুটি খো হওয়ার পূর্বে মাঠে প্রবেশ করতে হবে।

১১) সক্রিয় অনুধাবক যখন বসে থাকা অনুধাবকের পিঠে ঠিকভাবে হাত দিয়ে স্পর্শ করে খো উচ্চারণ করবে তখনই বসে থাকা অনুধাবক ধাবকের পেছনে ছুটতে পারবে।

১২) খেলার সময় ধাবক যদি পায়ের কোনো অংশ খেলার মাঠের সঙ্গে স্পর্শ না রেখে বাইরে চলে যায় তাহলে তাকে আউট বলে গণ্য হবে।

১৩) খো পাওয়ার পর কোনো সক্রিয় অনুধাবক যে নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে তখন সে নিজের কাঁধের কল্পিত রেখাকে ৯০° কোণের বেশি ঘোরাতে পারবে না। বেশি ঘোরালেই ফাউল বলে গণ্য হবে। তবে দুপাশের মুক্তাঞ্চলে যে-কোনো ভাবে ঘুরতে পারবে।

১৪) সক্রিয় অনুধাবককে একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে হলে ফ্রি জোন ব্যবহার করতে হবে। অনুধাবক কখনোই কেন্দ্রপথ ডিঙোতে পারবে না, করলেই ফাউল হবে।

১৫) সক্রিয় অনুধাবক কোনো নিয়মভঙ্গ না করে হাত দিয়ে কোনো ধাবককে স্পর্শ করলে বা ধাবকের দুই পা সীমারেখার বাইরে চলে গেলে মোর বা আউট বলে গণ্য হবে।

১৬) নক-আউট পদ্ধতিতে যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে তারা বিজয়ী হবে। কিন্তু যদি দুটি ইনিংসে নির্দিষ্ট সময়ে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়ে তবে দুই দলকে একবার ধাবক ও একবার অনুধাবক হয়ে একটি পর্যায় (Innings) খেলতে হবে। এর পরও যদি সমান

পয়েন্ট থাকে তাহলে একটি অতিরিক্ত পর্যায়ে খেলার সময় প্রথম আবর্তে অনুধাবকরা যে সময়ে একজন ধাবককে আউট করবে, প্রতিপক্ষ দল সেই সময়ের মধ্যে কোনো ধাবককে আউট করতে না পারলে রেফারি খেলা শেষ করে দেবেন।

১৭) কোনো দল যদি প্রথমে আক্রমণ করে একটি পর্যায়ের (First innings) শেষে বিপক্ষ থেকে ৯ বা তদূর্ধ বেশি পয়েন্ট অর্জন করে তবে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে 'ফলো অন' করতে বাধ্য করবে। এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দল যদি অধিকতর পয়েন্ট অর্জন করে তবে পূর্বোক্ত দল তাদের অনুধাবন আবর্তটি পুনরায় খেলার সুযোগ পাবে।

১৮) খো খো খেলা পরিচালনা করার জন্য ১ জন রেফারি, ২ জন আম্পায়ার, ১ জন সময়রক্ষক ও ২ জন স্কোরার থাকেন।

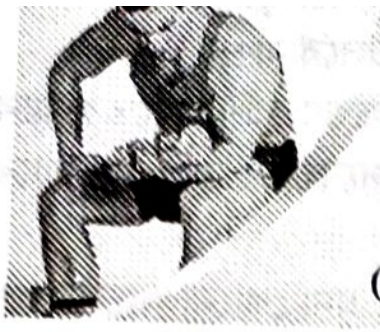

(২) ট্র্যাক এবং ফিল্ড
(রানিং ইভেন্ট, দীর্ঘ লম্ফন এবং উচ্চ লম্ফন)

(2) Track and Field
(Running Events, Long Jump and High Jump)

ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিষয়গুলির চর্চার মধ্য দিয়েই মানব সভ্যতার বিকাশ গড়ে উঠেছে। মানুষের জন্মের সাথেই এসেছে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিষয়গুলি—দৌড়ানো, লাফানো, ছোড়া। তবে বর্তমানে অ্যাথলেটিক্স কথাটা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-কোনো খেলায় দৈহিক শক্তি, দক্ষতা ও কলাকৌশলের ব্যবহার থাকলেই তাকে অ্যাথলেটিক্স স্পোর্ট বলা হয়। যেগুলি এখনও বিদ্যালয় ও ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বলা হয়। ট্র্যাক ইভেন্ট বলতে কতকগুলি দৌড় যেমন—১০০/২০০/৪০০/৮০০/১৫০০ মিটার ইত্যাদি। ফিল্ড ইভেন্ট এর কতকগুলি বিষয় হল লাফানো যেমন—উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন, ট্রিপল জাম্প ও পোল ভল্ট ইত্যাদি। ছোড়ার কতকগুলি বিষয় হল যেমন—সটপার্ট, ডিসকাস, জ্যাভলিন ও হ্যামার ইত্যাদি। যেহেতু দৌড়গুলি হয় নির্দিষ্ট অঙ্কিত পথে তাই তাদের ট্র্যাক বিষয় বলা হয়। আর লাফানো ও ছোড়া বিষয়গুলি ট্র্যাকের চিহ্নিত অংশ বাদ দিয়ে মাঠের যে-কোনো অংশে হয় তাই একে ফিল্ড বিষয় বলা হয়।

প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের প্রতিযোগিতা হত মূলত ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিষয়গুলির মধ্যেই। ১৮৯৬ সালে এথেন্সে প্রথম আধুনিক অলিম্পিক গেমসের অধিকাংশ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড। ১৯১২ সালে স্টকহোমে বিভিন্ন দেশের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠন—ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে প্রথম মহিলাদের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৫ সালে ভারতের জাতীয় সংস্থা—অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়। ১৯২৪ সালে ভারতে প্রথম প্রাদেশিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৫১ সালে পুরুষ খেলোয়াড় গুরুবচন সিং রন্ধবা ও ১৯৬২ সালে মহিলা খেলোয়াড় স্টেফি ডিসুজাকে প্রথম অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়।

● সাধারণ নিয়মাবলি :

সব প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই—

ক) আপত্তিজনক নয় এবং পরিষ্কার পোশাক পরেই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।

খ) প্রতিযোগী সংখ্যা ছাড়া কখনই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ) প্রতিযোগিতা চলাকালীন প্রতিযোগীরা কোনোরকম সাহায্য বা পরামর্শ বা তথ্য নিতে পারবে না। ব্যতিক্রম শুধু ম্যারাথন রোড রেস ও ক্রস কান্ট্রি দৌড়-এর ক্ষেত্রে।

ঘ) দৌড়ের সময় মাঠে মাইকে বা রেডিওতে গান বাজানো যাবে না।

দৌড় (Running Events)

দৌড়ের বিষয়গুলিকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—অল্প পাল্লার দৌড় (Sprint), মাঝারি পাল্লার দৌড় (Middle distance run) এবং দূরপাল্লার দৌড় (Long distance run)।

● দৌড়ের সাধারণ নিয়মাবলি :

১) যে নির্দিষ্ট পথে দৌড় প্রতিযোগিতা হয় তাকে ট্র্যাক বলে। ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটারের হওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ন্যূনতম ৮টি লেন থাকতে হবে এবং প্রতিটি লেন ১·২২ মি. চওড়া হতে হবে।

২) ৪০০ মিটার পর্যন্ত সকল দৌড়ের ক্ষেত্রে অন ইওর মার্ক (On your mark), সেট (Set) এবং বন্দুকের আওয়াজে (Fire) দৌড় আরম্ভ হয়। ১০০ মি. থেকে ৪০০ মিটারের দৌড়ের ক্ষেত্রে স্টার্টিং ব্লক (Starting block) ব্যবহার করতে হয়।

৩) ৪০০ মিটার পর্যন্ত দৌড়ের ক্ষেত্রে ক্রাউচ স্টার্ট ও স্টার্টিং ব্লক আবশ্যিক।

৪) মাথা, গলা হাত ও পা বাদ দিয়ে অংশ (Torso) দৌড় শেষ সীমানার অনুভূমিক এনে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শেষ হয়।

৫) দৌড় আরম্ভের সময় আরম্ভ রেখা স্পর্শ করা যাবে না। যদি কোনো দৌড়বিদ দৌড় আরম্ভের সংকেত পাওয়ার আগেই (False Start) দৌড় শুরু করে তবে পুনরায় দৌড়ের সংকেত দিতে হবে। তবে নতুন নিয়ম অনুসারে কোনো দৌড়বিদ একবার False Start নিলে প্রতিযোগীকে সেই Event থেকে বাতিল করা হয়।

৬) হার্ডল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হার্ডল এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। হার্ডলের বাইরে দিয়ে যাওয়া বা অন্যের হার্ডল দিয়ে অতিক্রম করা, হাত বা পা দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে হার্ডল ফেলে দেওয়াতে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করা হয়। তবে হার্ডল পড়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয় বা বাতিল বলে ধরা হয় না।

৭) রিলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যাটন হাতে নিয়ে দৌড়াতে হবে। যদি ব্যাটন হাত থেকে পড়ে যায় তবে যার হাত থেকে পড়ে যাবে সেই ব্যাটন তুলবে। রিলে পরিবর্তনের ২০ মিটারের মধ্যে অবশ্যই ব্যাটন বদল করতে হবে।

উচ্চলম্ফন (High Jump)

● সাধারণ নিয়মাবলি :

১) অবশ্যই এক পায়ে মাটি ছাড়তে হবে (Take off)।

২) প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে প্রতিযোগীরা কোন্ উচ্চতা থেকে লাফ শুরু করবে এবং প্রতি রাউন্ডের শেষে কতটা উচ্চতা বাড়ানো হবে তা বিচারকরা আগে জানিয়ে দেবেন।

৩) প্রতিটি উচ্চতায় পর পর তিনবার অকৃতকার্য হলে প্রতিযোগীকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে।

৪) উচ্চ লম্ফনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 2 সে. মি. ও পোল ভল্টের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ সে. মি. 'ক্রসবার' তুলতে হবে।

৫) উচ্চ লম্ফনে দৌড়ে আসার জন্য ১৫ থেকে ২৫ মি. এবং লাফিয়ে পড়ার জন্য ৫ মি. লম্বা × ৩ মি. চওড়া ন্যূনতম জায়গা থাকতে হবে।

৬) ক্রসবার ফাইবার, মেটাল বা অন্য বস্তু দ্বারা তৈরি হয় এবং যার দৈর্ঘ্য ৩.৯৮ মি. থেকে ৪·০২ মি. হয়। ওজন কখনোই ২ কেজির বেশি হবে না এবং ব্যাস ২৯ মিমি থেকে ৩১ মিমি হয়ে থাকে।

৭) দুটি আপরাইটের মধ্যে দূরত্ব হবে অবশ্যই ৪ মি থেকে ৪.০৪ মিটার। ল্যান্ডিং এরিয়া ও আপরাইটের মধ্যে ১০ সেমি ফাঁকা জায়গা থাকে।

৮) হাইজাম্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উচ্চতায় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তিনবার করে লাফানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

৯) ক্রসবার নীচে পড়ে গেলে বা ক্রসবারের নীচ দিয়ে চলে গেলে বা ক্রসবারের লাইন অতিক্রম করলে প্রতিযোগী সুযোগ গ্রহণ করছে বলে গণ্য করা হয়।

১০) মাটি থেকে ক্রসবারের ওপর অংশ পর্যন্ত উচ্চতার মাপ নেওয়া হয়।

১১) উচ্চ লম্ফনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানের জন্য টাই (Tie) ভাঙা—

টাই ভাঙার ক্ষেত্রে যে উচ্চতায় কয়েকজন অতিক্রম করেছে তাহলে সেই উচ্চতায় যে কম সুযোগে লাফিয়েছে তাকেই বিজয়ী বলে গণ্য করা হবে। এরপরও যদি কয়েকজন প্রতিযোগী সমান থাকে তাহলে প্রতিযোগিতায় যে কম সংখ্যক অকৃতকার্য (Failures) হয়েছে তাকেই বিজয়ী বলে গণ্য করা হবে। এরপরও যদি সিদ্ধান্তে না আসা যায় তাহলে শেষ উচ্চতায় যেখানে অকৃতকার্য হয়েছে সেখানে ওই প্রতিযোগীদের একটা করে লাফ

দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এরপরও সমান থাকলে ক্রসবার নামিয়ে বা উঠিয়ে একটা করে সুযোগ দিয়ে টাই ভাঙতে হবে।

দীর্ঘ লম্ফন (Long Jump)

● সাধারণ নিয়মাবলি :

১) লংজাম্পের রানওয়ে লম্বায় ৪৫ মিটারের বেশি হয় না এবং চওড়া 1·22 মিটার থেকে 1·25 মিটার হয়।

২) লংজাম্পের টেক অফ্ বোর্ড মাটির নীচে গাঁথা থাকে এবং উপরের রানওয়ে সমতল থাকে। টেক অফ্ বোর্ডের কিনারা ল্যান্ডিং এরিয়ার দিকে থাকে যাকে টেক অফ লাইন বলে।

৩) টেক অফ বোর্ডের সঙ্গে ল্যান্ডিং এরিয়ার কাছের দূরত্ব ১ মি. থেকে ৩ মিটার।

৪) টেক অফ বোর্ডের সঙ্গে ল্যান্ডিং এরিয়ার দূরবর্তী সীমানার দূরত্ব ১০ মি.।

৫) টেক অফ বোর্ড কাঠ বা অন্য শক্ত বস্তু নির্মিত একটি আয়তকার বিশেষ যা ১·২২ মি. লম্বা, ২০ সেমি (+২ সেমি) চওড়া এবং ১০ সেমি গভীর হয়। টেক অফ বোর্ড সর্বদা সাদা হয়।

৬) ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য ৭ মিটার থেকে ১০ মিটার এবং প্রস্থে ২·৭৫ মিটার থেকে ৩ মিটার হয়।

৭) লংজাম্পে কে কার পরে জাম্প করবে তা লটারির মাধ্যমে স্থির করা হয়।

৮) প্রতিযোগীর শ্রেষ্ঠ জাম্পকে ধরা হয়।

৯) প্রতিযোগীকে অবশ্যই এক পায়ে লাফ দিয়ে মাটি ছাড়তে হবে।

১০) জাম্পের পর প্রতিযোগীর শরীরের যে অংশ টেক অফ বোর্ডের নিকটবর্তী ভূমি স্পর্শ করেছে যেখান থেকে দূরত্ব মাপা হবে।

১১) আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে প্রত্যেককেই প্রথমে তিনটি করে লাফ দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম ৮ জনকে বেছে নিতে হবে। তাদের কৃতিত্ব অনুসারে সাজিয়ে নিয়ে পিছন দিক থেকে অর্থাৎ অষ্টম স্থানের প্রতিযোগী থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম জাম্পের সুযোগ দিতে হবে। পঞ্চম সুযোগের পর আবার তাদের কৃতিত্ব অনুসারে সাজিয়ে নিয়ে আবার পিছন দিক থেকে জাম্প ষষ্ঠ-এর সুযোগ দিতে হবে।

১২) লং জাম্পে নিম্নলিখিত কারণে কোনো জাম্পকে বাতিল করা হয় যখন—

ক) দৌড়ে বা লাফাতে গিয়ে টেক অফ লাইন অতিক্রম করে চলে গেলে।

খ) টেক অফ বোর্ডের দুপাশের জমির উপর থেকে যদি লাফ দেয়।

গ) লাফানোর পর ল্যান্ডিং এরিয়ার উপর দিয়ে পিছন দিক দিয়ে হেঁটে বা দৌড়ে চলে গেলে।

(খ) ট্র্যাক তৈরির নীতি

(Principles of laying out a running track)

দৌড়ানোর জন্য সাধারণত 400 মি. ট্র্যাক ব্যবহার করা হয়। ট্র্যাক সাধারণত মাটি বা ঘাসের হয়, তবে বর্তমানে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত ট্র্যাক ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক মানের ট্র্যাকে 8টি লেন থাকে এবং প্রতিটি লেন বা রাস্তা 1·22 মি. চাওড়া হয়।

● **ট্র্যাক তৈরির পদ্ধতি :**

১। ট্র্যাকের দুটি সোজা অংশ ও দুটি বাঁকা অংশ থাকে। ট্যাকের সোজা রেখা ও বাঁকা রেখার অনুপাত থাকে 2 : 3

400 মিটার ট্র্যাকের জন্য সোজা অংশ থাকে $\frac{400 \times 2}{5}$ মি. = 160 মি.

400 মিটার ট্র্যাকের জন্য বাঁকা অংশ থাকে = $\frac{400 \times 3}{5}$ মি. = 240 মি.

400 মিটার ট্র্যাকের একটি সোজা অংশের দূরত্ব = $\frac{160}{2}$ মি. = 80 মি.

400 মিটার ট্র্যাকের একটি বাঁকা অংশের দূরত্ব = $\frac{240}{2}$ মি. = 120 মি.

নতুন নিয়ম অনুসারে আদর্শ ট্র্যাকের দুটি সোজাপথ (Straight line) = 2 × 84·34 মি. দুটি বাঁকাপথ (Curves) – 2 × 36·80 মি. (Running distance radius) – ·30 মি. = 36·50 মি. (Curve radius) এবং raised border এর উচ্চতা 5 সেমি. থেকে 6·5 সেমি. ও প্রস্থ 5 সেমি. থেকে 25 সেমি. হবে।

ট্র্যাকের বক্ররেখার ব্যাসার্ধ নির্ণয় :

400 মিটার ট্র্যাকের জন্য—

(ক) দুটি সোজা অংশ কাল্পনিকভাবে বাদ দিলে দুটি অর্ধবৃত্তকে একত্রিত করলে বৃত্ত তৈরি হয়। বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ের সূত্র $C = 2\pi r$. এই সূত্রে কোনো একটি অর্থাৎ C বা r জানা থাকলে অপরটি বের করা যাবে।

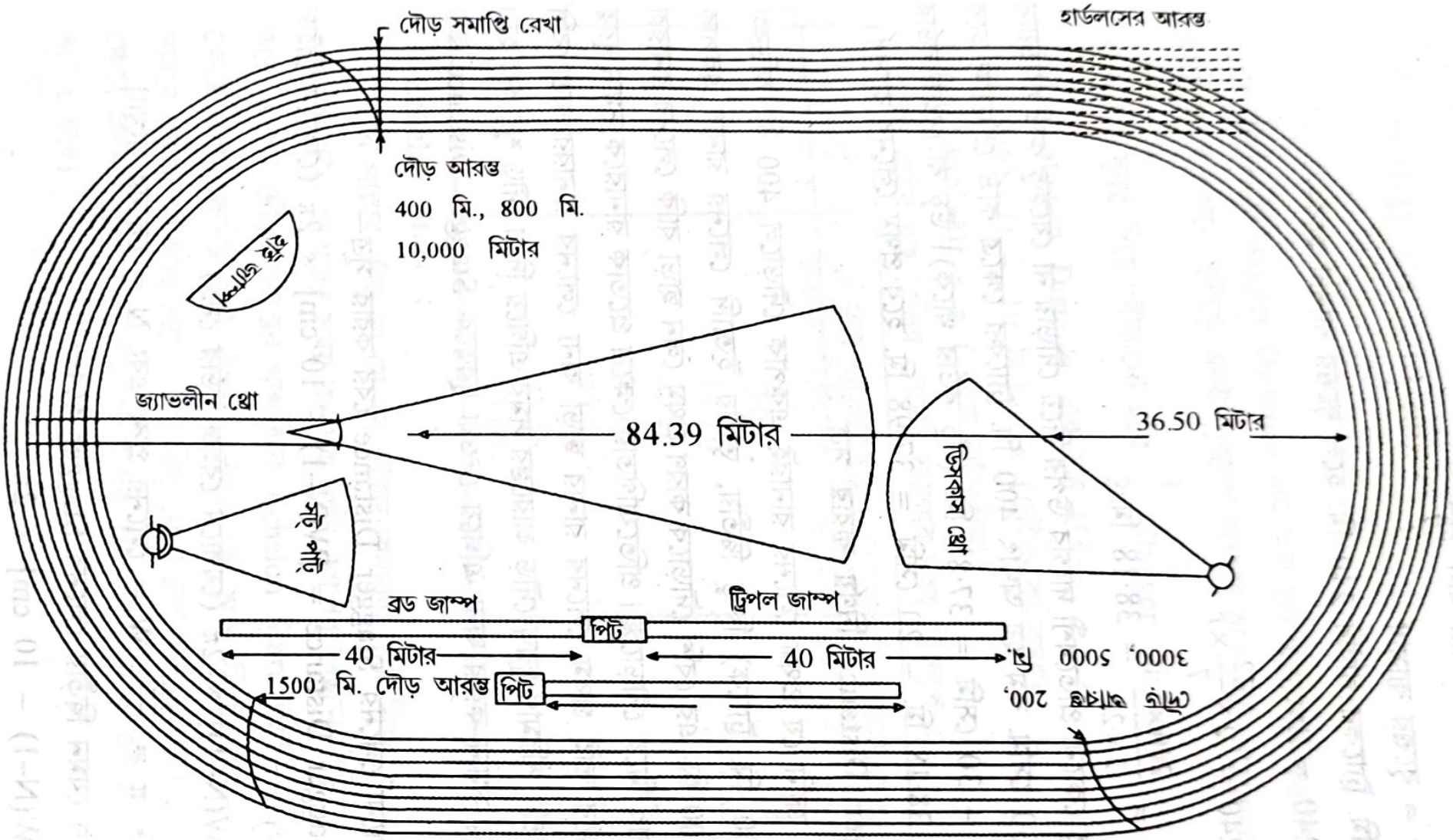
দৌড় সমাপ্তি রেখা
হার্ডলসের আরম্ভ
দৌড় আরম্ভ
400 মি., 800 মি.
10,000 মিটার
জ্যাভলীন থ্রো
84.39 মিটার
36.50 মিটার
ডিসকাস থ্রো
ব্রড জাম্প
ট্রিপল জাম্প
পিট
40 মিটার
40 মিটার
1500 মি. দৌড় আরম্ভ
পিট

৪০০ মিটার ট্র্যাক

C = Circumference বা পরিধি

π = পাই বা যার মান $\frac{22}{7}$

r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ

400 মি. ট্র্যাকের পরিধি 240 মি. হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে—

$$240 = 2\pi r$$

$$240 = 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$r = \frac{240 \times 7}{2 \times 22} = 38{\cdot}18 \text{ মি.}$$

যেহেতু কোনো প্রতিবেশী দাগের উপর দিয়ে দৌড়ায় না যেহেতু কার্ভ রেডিয়াস কম করে 30 সেমি. কম হয় অর্থাৎ 400 মি. ট্র্যাকের ক্ষেত্রে কার্ভ রেডিয়াস হবে 38·18 মি. – 30 সেমি. = 37·88 মি. (উঁচু বর্ডার থাকে)। উঁচু বা রেইজ বর্ডার না থাকলে 38·18 মি. – 20 সেমি. = 37·98 মি. হবে প্রথম লেনের ব্যাসার্ধ।

Stagger Distance নির্ণয় করার সূত্র :

আমরা জানি যে প্রথম লেনের রানারই একপাক দৌড়ালে 400 মি. অতিক্রম করবে (400 মি. ট্র্যাকে) কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি লেনের রানার একপাক দৌড়ালে 400 মি. এর বেশি দৌড়াবে কারণ প্রথম লেন ছাড়া বাকি লেনের রানাররা অধিক ব্যাসার্ধ নিয়ে দৌড়াচ্ছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রানারকে সমান দূরত্ব দৌড়াতে হবে তাই প্রথম লেনের রানার ছাড়া অন্য লেনের রানাররা যত বেশি দৌড়াবে ততটা পরিমাণ দূরত্ব দৌড় আরম্ভের সময় এগিয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করা হয়। এইরূপ দূরত্ব সমান করার জন্য এগিয়ে দেওয়া দূরত্বকে Stagger Distance বলা হয়।

যে-কোনো লেনের Stagger Distance বের করার সূত্র—

(i) Stagger Distance = [W(N–1) – 10 cm] × 2π (যেখানে রেইজ বর্ডার আছে)

(ii) [W(N–1)] × 2π (যেখানে রেইজ বর্ডার নেই)

[যেখানে $\pi = \frac{22}{7}$, W = লেনের প্রস্থ এবং N = লেনের সংখ্যা]

উদাহরণ যেমন দ্বিতীয় লেনের Stagger হবে—

[W(N–1) – 10 cm] × 2π

$$= [1{\cdot}22\ (2-1) - 10\ \text{cm}] \times \frac{2\times22}{7}$$

$$= [1{\cdot}22 \times 1 - 10\ \text{cm}] \times \frac{44}{7}$$

$$= 1{\cdot}12 \times \frac{44}{7} = 7{\cdot}04\ \text{মি.}$$

যে পদ্ধতিতে Stagger Distance বার করা হল তাহা দুটি বৃত্তাংশ দৌড়ানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো দৌড়ে একটা বৃত্তাংশ ব্যবহার হলে এই Stagger Distance এর অর্ধেক দূরত্ব দিয়ে দৌড়ানো হবে $\frac{1}{2}$ Stagger Distance।

Half Stagger Distance এর সূত্র হবে—

(i) [W(N–1) – ·10 মি.] × π (রেইজ বর্ডারসহ)

(ii) [W(N–1)] × π (রেইজ বর্ডারহীন)

রেইজ বর্ডার যুক্ত বিভিন্ন লেনের স্ট্যাগার দূরত্ব নিম্নরূপ :

লেন নং	ফুল স্ট্যাগার্ড (মি.)	হাফ স্ট্যাগার্ড (মি.)
1	—	—
2	7·09	3·52
3	14·71	7·36
4	22·38	11·19
5	30·05	15·03
6	37·71	18·86
7	45·38	22·69
8	53·05	26·53

Echelon Start :

মাঝারি পাল্লার দৌড় বা যে সব দৌড়ে রানাররা নিজ নিজ লেনে দৌড়াবে না সেক্ষেত্রে দৌড় আরম্ভের সময় রানাররা বৃত্তীয় চাপের পিছনে দাঁড়িয়ে দৌড় আরম্ভ করে, এরকম দৌড় আরম্ভের পদ্ধতিকে Echelon Start বলে। 400 মি. ট্র্যাকের ক্ষেত্রে প্রথম লেনের মোট বৃত্তাংশ পথের 1/8 অংশ নিয়ে প্রথম লেনের ভিতর সামনে এগিয়ে ওই দূরত্ব গিয়ে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চাপ কাটতে হবে। 200 মি. ট্র্যাকের ক্ষেত্রে প্রথম লেনের মোট বৃত্তাংশ পথের 1/6 অংশ নিয়ে ওই একই ভাবে চাপ কাটতে হবে।

Diagonal Excess :

কোনো কোনো দৌড়ের ক্ষেত্রে প্রথম পাক নিজ নিজ লেনে দৌড়ানোর পরে সকলে প্রথম লেনে দৌড়ায়, দৌড়বিদদের নিজ নিজ লেনে সমান দূরত্ব দৌড়ানোর জন্য যেমন Stagger এর ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ইত্যাদি লেনের রানাররা যখন নিজের লেন থেকে প্রথম লেনে আসে তখন তাদের অধিক দূরত্ব দৌড়াতে হয়। সেক্ষেত্রে সেই সকল রানারদের দূরত্ব সমান করার জন্য প্রথম লেনের সাপেক্ষে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ইত্যাদি রানাররা যে পরিমাণে তির্যক দূরত্ব বেশি দৌড়াছে, দৌড় আরম্ভের সময় Stagger Distance এর সঙ্গে নির্দিষ্ট লেনের অতিরিক্ত তির্যক দূরত্ব যোগ করা হয়। যাকে Diagonal Excess বলা হয়। Diagonal Excess নির্ণয়ের পদ্ধতি হল সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ নির্ণয়ের পদ্ধতি।

Diagonal Excess =

$$= \sqrt{\left\{\begin{matrix}\text{Length of}\\ \text{the}\\ \text{Straight}\end{matrix}\right\}^2 + \left\{\begin{matrix}\text{Distance from 1st}\\ \text{runner to runner}\\ \text{of the desired lane}\end{matrix}\right\}^2} - \{\text{lenght of the straight}\}$$

উদাহরণ স্বরূপ কোনো 400 মি. ট্র্যাকের একটি Straight Line 79 মি. হলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় লেনের Diagonal Excess দূরত্ব হবে—

$$= \sqrt{(79m)^2 + (1{\cdot}12m)^2} = 79{\cdot}008 \text{ মি.}$$

অর্থাৎ দ্বিতীয় লেনের Diagonal Excess দূরত্ব হবে 79·008 মি. – 79 মি. = 0·008 মি. অতিরিক্ত তির্যক দূরত্ব বা Diagonal Excess হবে 0·008 মি.।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য :

(১) ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কৌশল, ক্ষমতা ও প্রতিভা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।

(২) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কোনো প্রতিযোগী তার ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করে উৎসাহিত হয়, এবং অন্যান্যদের আনন্দ দান করে।

(৩) খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

(৪) প্রতিযোগীদের পরবর্তী উন্নতিতে প্রতিযোগিতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৫) প্রতিযোগিতা শত্রুতা ভুলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে বিশেষ উপযোগী।

(৬) ব্যক্তিসত্তা উন্নতিতে প্রতিযোগিতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৭) প্রতিযোগিতা তার সংগঠনিক দিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সু-ক্রীড়া সংগঠক তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৮) প্রতিযোগিতা বিনোদনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র।

প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ (Types of Tournament) :

ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে চারভাগে ভাগ করা হয়।

(১) নক আউট বা এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট (Knockout or Elimination Tournament)

(২) লীগ বা রাউন্ড রবিন টুর্নামেন্ট (League or Round Robin Tournament)

(৩) কমবিনেশন টুর্নামেন্ট (Combination Tournament)

(৪) চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট (Challenge Tournament) :

(১) নক আউট বা এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট (Knockout or Elimination Tournament) :

এই ধরনের প্রতিযোগিতা চার প্রকারের। যথা—

(i) সিঙ্গাল নকআউট বা সিঙ্গাল এলিমিনেশন (Single knockout or single elimination)

(ii) ডাবল নকআউট বা ডাবল এলিমিনেশন (Double knockout or double elimination)

(iii) সান্ত্বনা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার (Consolation 1st and 2nd Type)

(iv) বাগনাল ওয়াইল্ড টুর্নামেন্ট (Bagnull Wild Tournament)

(২) লীগ বা রাউন্ড রবিন টুর্নামেন্ট (League or Round Robin Tournament) :

এই ধরনের প্রতিযোগিতা দুই প্রকারের হয়। যথা—

(i) সিঙ্গাল লীগ (Single League)

(ii) ডবল লীগ (Double League)

(৩) কমবিনেশন টুর্নামেন্ট (Combination Tournament) :

এই ধরনের প্রতিযোগিতা চার প্রকারের হয়। যথা—

(i) নকআউট কাম নকআউট (Knockout cum Knockout)

(ii) নকআউট কাম লীগ (Knockout cum League)

(iii) লীগ কাম লীগ (League cum League)

(iv) লীগ কাম নকআউট (League cum Knockout)

(৪) চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট (Challenge Tournament) :

এই ধরনের প্রতিযোগিতা দুই প্রকারের হয়। যথা—

(i) ল্যাডার টুর্নামেন্ট (Ladder Tournament)

(ii) পিরামিড টুর্নামেন্ট (Pyramid Tournament)

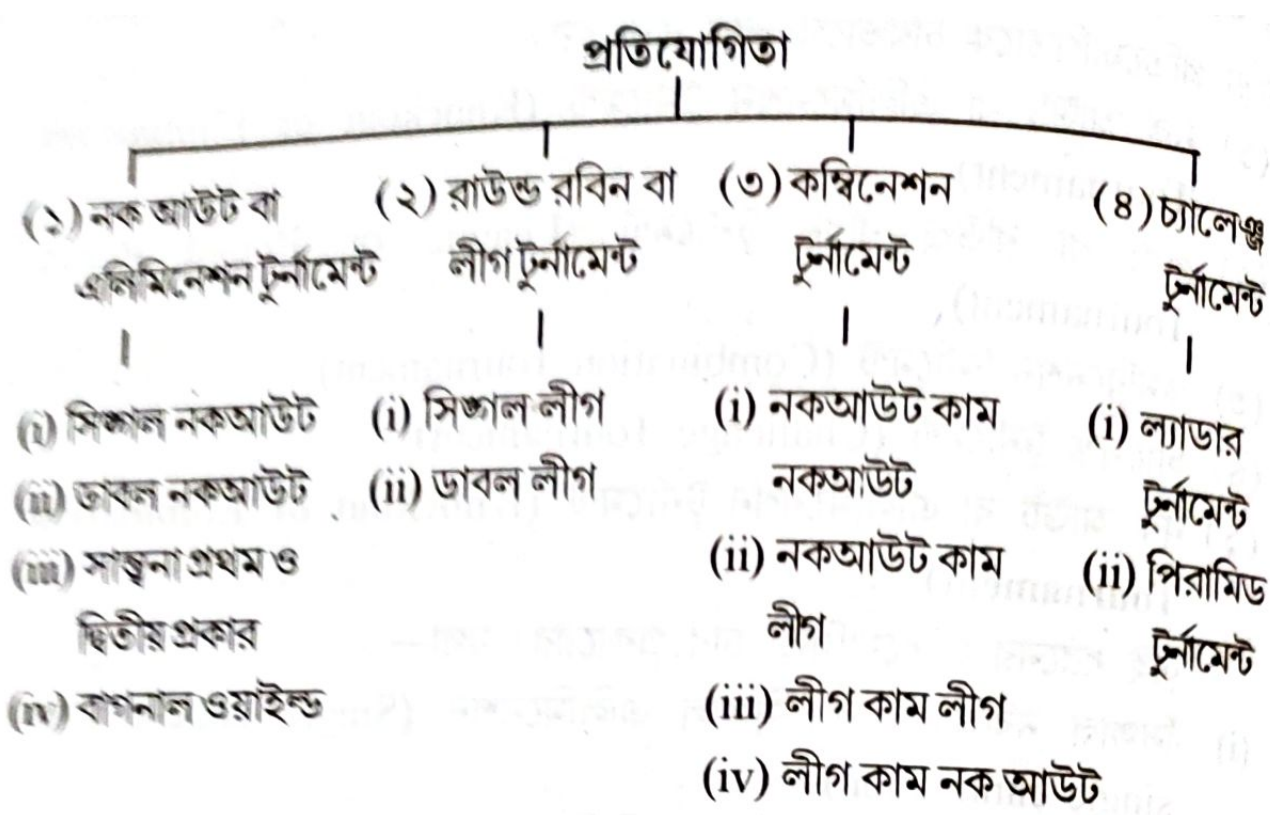

নকআউট বা এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট (Knockout or Elimination Tournament

(ক) সিঙ্গাল নকআউট বা সিঙ্গাল এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট (Single Knockout or Single Elimination Tournament) :

যে-কোনো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রতিযোগিতা সবচেয়ে সহজ ও তাড়াতাড়ি পদ্ধতি। এই প্রকার প্রতিযোগিতায় কোনো ব্যক্তি বা কোনো দল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একবার পরাজিত হলে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। কেবলমাত্র বিজয়ী দল বা ব্যক্তি পরবর্তী রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

সিঙ্গাল নকআউট প্রতিযোগিতায় মোট কতগুলি ম্যাচ খেলা হবে তা নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

সূত্রটি হল— $(n - 1)$

যেখানে 'n'-এর অর্থ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মোট দলের সংখ্যা। এ থেকে '1' বাদ দিলে নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতায় কতগুলি ম্যাচ হবে তা জানা যাবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো সিঙ্গাল নকআউট প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা যদি 12 হয় তবে ম্যাচের সংখ্যা হবে $12-1=11$টি

সিঙ্গাল নকআউট খেলার তালিকা প্রস্তুত পদ্ধতি (Method of drawing Single Knockout Fixture) :

যদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী '2' এর কোনো ঘাত বা মাত্রা অনুযায়ী হয় (being the power of two) যথা—2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6 ইত্যাদি। অর্থাৎ 2, 4, 8, 16, 32, 64 ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে খেলার তালিকা প্রস্তুত সহজ হয়। নীচে 8টি দলের সিঙ্গাল নকআউট ক্রীড়া তালিকার একটা নমুনা দেওয়া হল—

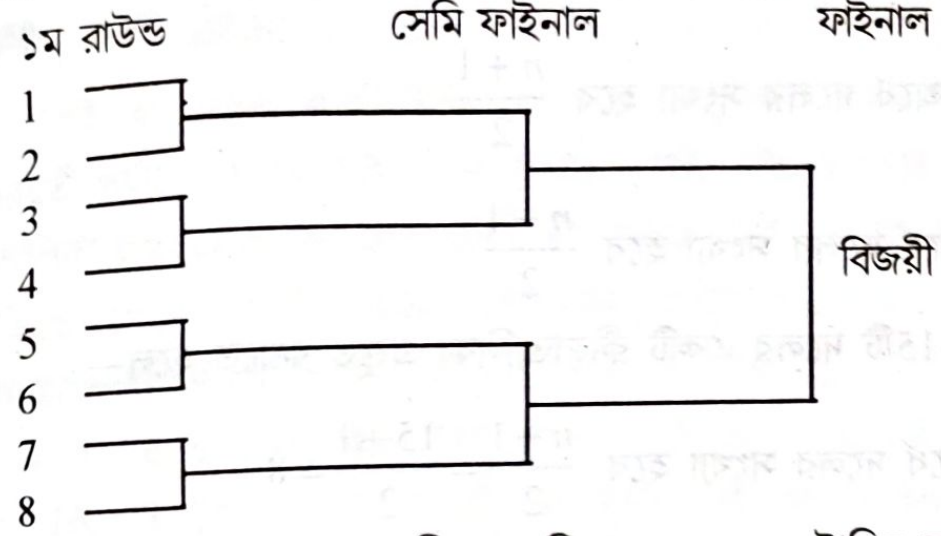

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে সবসময় লটারির মাধ্যমে তালিকাতে সাজানো হয়। খেলার তালিকা প্রস্তুতের সময় খেলার তারিখ, সময় এবং স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

কোনো ক্রীড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে হয়।

যেমন—প্রত্যেক অর্ধে দলের সংখ্যা (Teams in Each Half)

প্রথমেই অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে দুটি অর্ধে বিভক্ত করতে হবে। অর্থাৎ উপরের অর্ধ ও নীচের অর্ধ।

(i) যদি কোনো প্রতিযোগিতায় দলের (n) সংখ্যা জোড় হয় তবে উপরের এবং নীচের অর্ধে সমসংখ্যার দল $\left(\frac{n}{2}\right)$ থাকবে। দুটি অর্ধেই দলের সংখ্যা সমান হবে।

অর্থাৎ উপরের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n}{2}$

নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n}{2}$

উদাহরণস্বরূপ **12টি দলের** একটি ক্রীড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হলে

উপরের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n}{2}=\frac{12}{2}=6$

এবং নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n}{2}=\frac{12}{2}=6$

(ii) যদি দলের সংখ্যা বিজোড় সংখ্যক হয়, তবে

উপরের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n+1}{2}$

নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n-1}{2}$

উদাহরণস্বরূপ 15টি দলের একটি ক্রীড়াতালিকা প্রস্তুত করতে হলে—

উপরের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n+1}{2}=\frac{15+1}{2}=8$

নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে $\frac{n-1}{2}=\frac{15-1}{2}=7$

যদি **দলের সংখ্যা 8, 12, 9, 15** হয় তা হলে এই সূত্রের সাহায্যে প্রত্যেক ভাগের দলের সংখ্যা হবে, যেমন—

দলের সংখ্যা	উপরের অর্ধে দল	নীচের অর্ধে দল
8 (জোড়)	$\frac{n}{2}=\frac{8}{2}=4$	$\frac{n}{2}=\frac{8}{2}=4$
12 (জোড়া)	$\frac{n}{2}=\frac{12}{2}=6$	$\frac{n}{2}=\frac{12}{2}=6$
9 (বিজোড়)	$\frac{n+1}{2}=\frac{9+1}{2}=\frac{10}{2}=5$	$\frac{n-1}{2}=\frac{9-1}{2}=\frac{8}{2}=4$
15 (বিজোড়)	$\frac{n+1}{2}=\frac{15+1}{2}=\frac{16}{2}=8$	$\frac{n-1}{2}=\frac{15-1}{2}=\frac{14}{2}=7$

অতএব দেখা যাচ্ছে যে যদি দলের সংখ্যা 8, 12 (জোড়) হয়, তবে উপরের অর্ধে ও নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা সমান সমান হবে যথাক্রমে 4, 4 এবং 6, 6। যদি দলের সংখ্যা 9 (বিজোড়) হয় তবে উপরের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে 5 এবং নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে 4। দলের সংখ্যা যদি 15 (বিজোড়) হয় তবে উপরের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে 8 এবং নীচের অর্ধে দলের সংখ্যা হবে 7টি। এই সূত্রের সাহায্যে প্রত্যেক অর্ধে দলের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি।

বাই (Bye) :

'বাই' হল এমন একটি সুবিধা যেখানে দলগুলিকে প্রথম পর্যায়ে না খেলিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। 'বাই' (Bye) প্রথম রাউন্ডে দেওয়া হয় (তালিকা প্রস্তুতের সময়) কিন্তু কার্যত যে দলকে 'বাই' দেওয়া হয় সেই দল দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলে। অর্থাৎ 'বাই' কেবলমাত্র প্রথম রাউন্ডেই দেওয়া হয়। যখন অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা 'দুই' এর 'ঘাত' বা 'মাত্রা' (2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 অর্থাৎ 2, 4, 8, 16, 32) অনুযায়ী না হয় অর্থাৎ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ইত্যাদি সেক্ষেত্রে 'বাই' দেওয়া হয়।

বাই নির্ণয় পদ্ধতি (Procedure for determining Byes) :

যদি কোনো প্রতিযোগিতায় দলের সংখ্যা পাওয়ার অফ্ টু (Power of two) থেকে কম হয়, সেক্ষেত্রে দুই এর ঘাত থেকে মোট দলের সংখ্যা বাদ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে ততগুলি বাই দিতে হবে। যেমন—

(ক) দলের সংখ্যা = 12

এক্ষেত্রে 12 এর পরে '2' এর পরবর্তী ঘাত বা মাত্রা $2^4 = 16$

∴ বাই এর সংখ্যা হবে 16 – 12 = 4টি।

(খ) দলের সংখ্যা = 17

এক্ষেত্রে 17 এর পরে '2' এর পরবর্তী ঘাত বা মাত্রা $2^5 = 32$

∴ বাই এর সংখ্যা হবে 32 – 17 = 15টি

বাই ধার্য করার পদ্ধতি (Procedure of fixing Byes) :

ক্রীড়াসূচি তৈরি করার সময় কোন্ কোন্ দল বাই পাবে তা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে করতে হবে। অংশগ্রহণকারী মোট দলগুলিকে উপরের ও নীচের অর্ধে ভাগ করার পর নিম্নিলিখিত পর্যায়ক্রমিকভাবে বাই ধার্য করতে হবে।

★ প্রথম বাই দেওয়া হবে দ্বিতীয় অর্ধের অন্তিম দলকে

★ দ্বিতীয় বাই দেওয়া হবে প্রথম অর্ধের প্রথম দলকে

★ তৃতীয় বাই দেওয়া হবে দ্বিতীয় অর্ধের প্রথম দলকে

★ চতুর্থ বাই দেওয়া হবে প্রথম অর্ধের অন্তিম দলকে

বেশি সংখ্যক বাই-এর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট বাইগুলিতে একই নিয়মে ধার্য করা হবে।

12টি দলের একটি নকআউট ফিক্সচার নিম্নরূপ ঃ

মোট দলের সংখ্যা = 12

মোট বাই-এর সংখ্যা = $2^4 = 16 - 12 = 4$টি

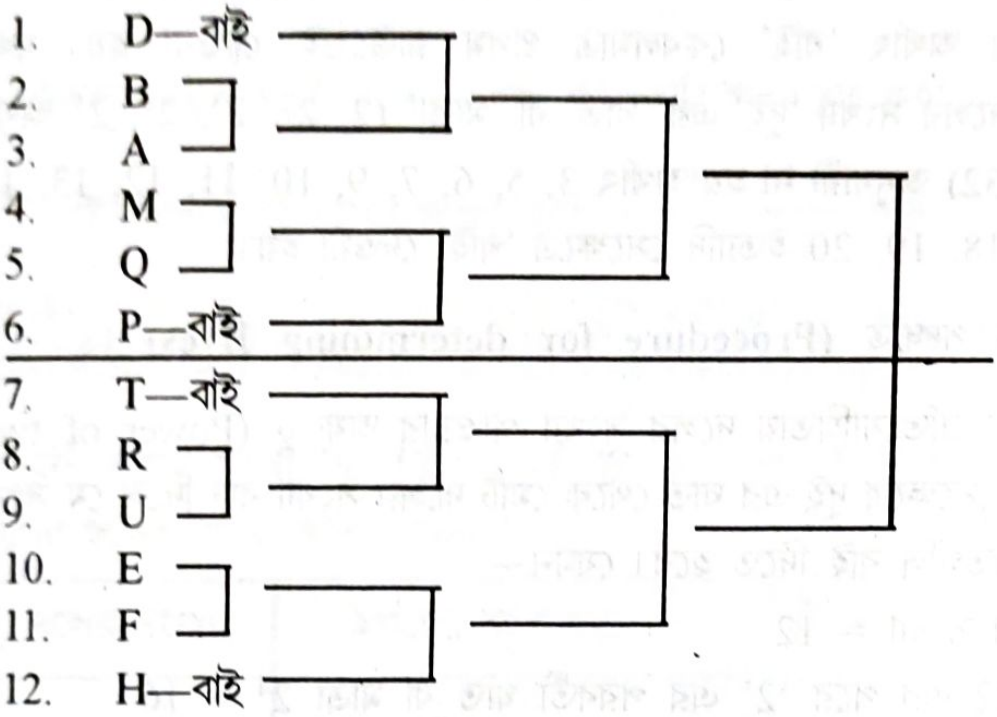

উপরের ও নীচের অর্ধে বাই-এর সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি :

(ক) যদি 'বাই' এর সংখ্যা **জোড়** সংখ্যক হয়, সেক্ষেত্রে—'বাই' এর সংখ্যা ÷ 2 অর্থাৎ উপরের ও নীচের অর্ধে সমান সংখ্যক বাই দিতে হবে।

যথা—বাই-এর সংখ্যা যদি 6 হয়, তখন উপরের ও নীচের উভয় অর্ধে **3টি করে** বাই দিতে হবে।

(খ) যদি 'বাই' **বিজোড়** সংখ্যক হয়, সেক্ষেত্রে—

$$\text{উপরের অর্ধে বাই-এর সংখ্যা হবে} = \frac{\text{বাই-এর সংখ্যা} - 1}{2}$$

নীচের অর্ধে বাই-এর সংখ্যা হবে = $\frac{\text{বাই-এর সংখ্যা} + 1}{2}$

যথা—বাই-এর সংখ্যা যদি 13 হয়, তখন

উপরের অর্ধে বাই-এর সংখ্যা হবে = $\frac{13-1}{2} = \frac{12}{2} = 6$ টি

নীচের অর্ধে বাই-এর সংখ্যা হবে $\frac{13+1}{2} = \frac{14}{2} = 7$ টি